# পাঠের আলোয়

মহাভারতের সমাপ্তিপর্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎপর্বটি। এই সাক্ষাৎ না ঘটলে মহাভারতের সমাপ্তি পর্ব হয়ত অন্যরকমভাবে লেখা হত। 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬, 'কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ও নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছিলেন এমন একটি স্পর্শকাতর অংশ। গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তিতাড়িত নায়কদের মতই মহিমা ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত—বীর কর্ণ। উনিশ শতকের রেনেসাঁর শেষ পর্বে অর্জুন, যুধিষ্ঠির বা কৃষ্ণ নয়, কর্ণ হয়ে উঠলেন নায়ক। এমন বিপ্রতীপতা, এমন ট্র্যাজিক অবসান গ্রীক নাটকেও বিরল। মা এবং সন্তানের সম্পর্কের এমন একটি অভিজ্ঞান বিশ্বসাহিত্যে আর একটিও নেই।

প্রথম সংলাপেই রয়েছে নাটকীয়তা। সূর্যপুত্র কর্ণ। জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার শেষ হবে আজ। সূর্য তাই অস্তগামী। যেন সচেতনভাবেই দিবাবসানের এই চরম মুহূর্তটিকে বেছে নিলেন কবি। পরিচয়ের সূচনায় কর্ণ জানালেন, তিনি 'অধিরথ সূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত'। মনে হয়, শুধুমাত্র পিতার পরিচয় নয়, মাতার পরিচয় দিতে কর্ণ বেশি আগ্রহী। মহাভারতের কালে ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তানকে বলা হত 'সূত'। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বা সম্মান রক্ষার্থে 'রাধাগর্ভজাত' বলতে কর্ণ গর্ব অনুভব করেছেন। তিনি যখন পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তখনও নিজেকে পরিচয় দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ বলে। পুরাণের যুগে মায়ের পরিচয় স্বীকৃতিলাভের ঘটনা কম ছিল না।

অস্তগামী সূর্যের বন্দনায় স্থির কর্ণ। অপেক্ষারতা কুন্তী। 'মাতঃ' সম্বোধনে প্রথম সংলাপেই কর্ণ চরিত্রের একটা মার্জিত পরিচয়ে ধরা পড়ে। কর্ণের ধীর-স্থির চরিত্রের পাশে প্রথম সংলাপ থেকেই কুন্তী চরিত্রের বৈপরীত্য স্পষ্ট। সামান্যতম অপেক্ষা কুন্তীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রথম বাক্যেই সমর্পণ করেছেন নিজের লজ্জা :

বৎস তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্বসাথে,

সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্বলাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

এ নাটক পাঠের আগেই আমরা জানি, কর্ণ, কুন্তীর কানীন পুত্র। কিন্তু যখনই একটা টেক্সট্ পড়া হয়, তখন পাঠক তার বর্তমানকে সঙ্গী করে ঐ ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়েন। ফলে নাটকের চরিত্র ঘটনা, পাঠকের মন—সব মিলিয়ে অস্তিতার একটা দর্শন তৈরী হতে থাকে। সেই প্রেক্ষিতেই আমাদের তাৎক্ষণিক বিচারবোধ সচেতন হয়ে পড়ে। আমরা কর্ণ চরিত্রের নম্রতায় বিবশ হয়ে পড়ি অন্যদিকে বিমূঢ় হয়ে যাই কুন্তীর এমন আত্মঘোষণায়। এর চেয়ে স্পষ্টভাষায় কোনো নারী পুত্রের কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারেন না। কিন্তু সবটুকু বললেও কুন্তীর কথার রহস্য বোঝেন নি কর্ণ।

ক্রমশ পাঠক বুঝতে পারেন যে, কোনো এক অদৃশ্য বন্ধন অনুভব করছেন কর্ণ। কুন্তীর কণ্ঠস্বর কর্ণের চেতনায় আলোড়ন তোলে :

তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে, পশি কর্ণপর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা

কোনো এক অজানা জগত ডাক দিচ্ছে কর্ণকে। সেই রহস্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন 'অপরিচিতা'র কাছে। কর্ণের চেতনায় জেগে উঠছে আর একটি তল। সেই তলে ডুবুরির মত নেমে পড়ছে তাঁর মন। কুন্তীর সামনে এবার আরও কঠিন পরীক্ষা। আরও স্পষ্ট করে যা বলতে হবে তার জন্য কুন্তী আকাঙক্ষা করছেন অন্ধকার রাতের নিবিড়ত্ব। কুন্তী অস্ত্র পাল্টালেন। এবার নিজেকে পরিচয় দিলেন 'কুন্তী' বলে। বিরোধী শিবিরের প্রতিস্পর্ধী বীর অর্জুনের মাতাকে যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় নিজের সামনে দেখে বিস্মিত কর্ণের উক্তি—

তুমি কুন্তী! অর্জুন জননী!

এখান থেকে কর্ণের ট্রাজেডির সূচনা। চিরকাল অর্জুন তার প্রতিপক্ষ। সেই অস্ত্রপরীক্ষা থেকে শুরু হয়েছে এই বিরোধিতার। সেই দুরন্ত বীরের মাতা আজ কিসের প্রার্থী? বিস্ময়, ঔৎসুক্য, জিজ্ঞাসা—সমস্ত একাকার কর্ণের উচ্চারণে।

প্রমাদ গুনলেন কুন্তী। অনুরোধ করলেন, 'অর্জুনজননী' বলে কর্ণ যেন মনে কোনো 'দ্বেষ' না রাখেন। কারণ, সেক্ষেত্রে কুন্তীর প্রত্যাশার প্রাপ্তি ঘটবে না। কর্ণের উদারতার প্রাঙ্গণে কোনো বাধার প্রাচীর কুন্তীর এখন কাম্য নয় ; রণনীতি

তিনি ভালই জানেন। তাই ঝুলি থেকে বের করলেন নতুন অস্ত্র। অস্ত্র পরীক্ষার দিন কর্ণের অপমানের প্রসঙ্গে নিজের গোপন অশ্রুর কথা উল্লেখ করলেন। 'রাজকুলে জন্ম নহে যার/অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'—মন্তব্যে লজ্জিত, অপমানিত কর্ণের জন্য তাঁর বক্ষ দগ্ধ হলেও সেদিনের 'অভাগিনী', আর আজকের 'অভাগিনী' কুন্তীর মধ্যে মেরুর পার্থক্য। 'অভাগিনী' কুন্তী সেদিন কর্ণকে জনসমক্ষে নিজের পুত্র বলে ঘোষণা করতে পারেন নি। অথচ আমরা জানি, তিনি আজ আর এক পুত্রের স্বার্থে কর্ণকে জানাতে এসেছেন জন্মপরিচয়। পরিস্থিতি বদলেছে। অস্ত্রপরীক্ষার দিন যে ঘোষণায় বদলে যেতে পারত কর্ণের জীবন তা কুন্তী করেন নি। সেদিন নিজের কুলমর্যাদা, রাজসম্মান তাঁর কাছে ছিল বড়। আজ সেই ঘোষণায় তিনি কর্ণের দ্বারে প্রার্থী। অথচ আজ কর্ণের কাছে প্রয়োজন নেই জন্মের প্রকৃত পরিচয়। নিয়তির এমন লিখন সত্য শুধুমাত্র কর্ণের জন্য। কর্ণের এমন দুর্ভাগ্যের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায় কুন্তীর গোপন অশ্রু, 'অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধা'। সেই অশ্রু অস্ত্রপরীক্ষার দিন হয়ত মিথ্যা ছিল না, কিন্তু আজ এগুলি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এক-একটি উপলক্ষ্যমাত্র। পাঠক কর্ণ-কুন্তীর সম্পর্কে জানেন। আর জানেন বলেই কুন্তীর প্রতিটি কথা ও তার অনুষঙ্গ তাঁকে পাঠকের সহানুভূতির বিপরীত বিন্দুতে নিয়ে চলে।

রাজমাতা কুন্তীর আগমনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয় কর্ণের কাছে। প্রণাম জানিয়ে কর্ণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

এযে রণভূমি,
আমি কুরু সেনাপতি।

দানবীর কর্ণের চরিত্রবৈশিষ্ট্য কুন্তী জানেন। এ পর্যন্ত দু'জনের সংলাপ থেকে একথা স্পষ্ট যে, কুন্তী কোনো এক প্রত্যাশায় কর্ণের কাছে এসেছেন। এবার সরাসরি বললেন সে কথা—

পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণের উত্তরে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় তাঁর ধর্মবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা—

ভিক্ষা! মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

ক্ষণিকের দ্বন্দ্ব এলেও স্থিতধী কর্ণ। একচুলও নড়েননি নিজের দৃঢ়তা থেকে। যুদ্ধক্ষেত্রে এক কুরুসেনাপতির কাছে বিপক্ষের পরম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরের মাতার উপস্থিতি এবং রহস্যময় বাক্যালাপ কর্ণকে উদ্বিগ্ন করলেও কুন্তীর উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। এবার কুন্তীর বক্তব্য—

এসেছি তোমারে নিতে।

বিস্মিত কর্ণের উক্তি—

কোথা লবে মোরে!

প্রত্যুত্তরে কুন্তীর অমোঘ বাক্য—

তৃষিত বক্ষের মাঝে—লব মাতৃক্রোড়ে।

বহুবছর আগে একদিন এই দাবী নিয়ে কুন্তী আসতে পারতেন। কিন্তু পাঠক জানেন, আজ এই দাবী মূল্যহীন। কর্ণ জানেন তাঁর জীবনে এটাই সত্য যে তিনি 'কুলশীলহীন ক্ষুদ্র নরপতি'। পঞ্চপাণ্ডবের গৌরবে ধন্যা রাজমাতা কুন্তীর কাছে তাঁর স্থান কোথায়? অথচ কুন্তীর দাবী—

জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।

কর্ণের বিমূঢ় প্রশ্ন—কোন্ অধিকারে তিনি সেখানে প্রবেশ করবেন? কর্ণের যুক্তি আর একবার তাঁর ধর্মচেতনাকে প্রমাণ করছে। পাণ্ডবরা 'সাম্রাজ্যসম্পদে বঞ্চিত'। তাই তাঁদের 'মাতৃস্নেহধনে' কেমন করে তিনি ভাগ নেবেন? জীবনের অভিজ্ঞতায় কর্ণ জেনেছেন, পৃথিবীতে সব ঘটনাই ঘটতে পারে ; স্ত্রীকেও দ্যূতপণে হারানো যায়, কিন্তু—

দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

'বিধাতা'র প্রশ্নেই কুন্তী খুলে দিলেন শেষ দ্বারটি—

পুত্র মোর, ওরে
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন—সেই অধিকারে
আর ফিরে সগৌরবে,

বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস যার জন্মলগ্নেই ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলা, সে

কোথায় ফিরবে সগৌরবে? কুন্তীর এ সমস্ত কথা কর্ণের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়; বাস্তবজগত থেকে তিনি পৌঁছে গেলেন মায়াচ্ছন্ন লোকে। অন্য এক জগৎ, অন্য এক অধরা জীবন যেন ডাক দিচ্ছে কর্ণকে—

পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত সম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন যে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।

বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া মাতৃগর্ভের অনুভূতি কর্ণের চারপাশে আঁধার ঘনিয়ে তুলছে। এক বিহ্বলতায় কর্ণের চেতনা আলোড়িত। অনুভব করছেন যুগ-যুগান্তরের কোনো বন্ধন। স্নেহের আকুলতায় কর্ণের উচ্চারণ—

সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল।

এতদিনের আকাঙ্ক্ষিতকে পাবার আশায় কর্ণের হৃদয় উদ্বেল। এবার কর্ণের বক্তব্যে জানা গেল—

শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি।

এই সত্যবয়ানে স্পষ্ট হয়ে যায় সূচনায় নিজেকে ‘রাধাগর্ভজাত’ বলে বিশেষিত করার অর্থ। জন্মপরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা কর্ণের ছিল না। তাই চেতনার কোনো একটি তলে অপেক্ষিত ছিল মাতৃস্নেহের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা। তৃষিত শৈশবের কথা জানালেন কুন্তীকে—

কতবার
হেরেছি নিশীথ স্বপ্নে জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়,
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়’
‘জননী, গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ’—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষ্ণার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি।

শৈশবের ছিন্ন স্বপ্ন আজ কর্ণের সামনে উপস্থিত পাণ্ডবজননীর বেশে। তাঁর মন ‘পঞ্চপাণ্ডবের পানে ‘ভাই’ বলে ধায়। মায়ের আহ্বানে যেন তুচ্ছ হয়ে যায়—

নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়।
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।

এ কর্ণ যেন অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা। এই কর্ণের জন্য আমরা বেদনা অনুভব করি। কর্ণ বাস্তব থেকে সরে গেছেন বহু দূরে, শৈশবের আকাঙ্ক্ষিত দিনগুলিতে। ধ্রুবতারার মত যে মাতৃস্নেহচ্ছায়া কর্ণের শৈশবের আকাশে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, আজ তারই আশ্বাসে কর্ণের মন ছুটে চলেছে কুন্তীর আশ্রয়ে। বহুকালের সঞ্চিত মাতৃস্নেহাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে। আকুল কর্ণ বারবার শুনতে চান ‘পুত্র’ সম্বোধন—

দেবী, কহো আরবার
আমি পুত্র তব।

আশ মেটে না তাঁর। কিন্তু এবার কর্ণের চেতনার অন্য এক তলে টান পড়ে। কর্তব্যের টান, স্নেহের টান, স্নেহের আকাঙ্ক্ষাকে ছাপিয়ে যায় কর্ণের হৃদয়ের অভিমান। আজীবনের লাঞ্ছনার বেদনা, অবজ্ঞার চাবুক তাঁকে যে জীবন দিয়েছে, সেই জীবনের জন্য কর্ণ এবার কৈফিয়ত চাইলেন কুন্তীর কাছে—

১. কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কূলশীলমানহীন মাতৃস্নেহহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাতবিশ্বে।
২. কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে—
৩. কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকূল হতে।
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে।
৪. মাতঃ নিরুত্তর?

লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে—
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। থাক, থাক তবে—
কহিয়ো না কেন তুমি ত্যাজিলে আমারে।
৫. বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সজ্ঞান হতে করিলে হরণ
সে কথার দিয়ো না উত্তর।

শেষ পর্যন্ত কর্ণ কুন্তীকে প্রশ্ন করেছেন—

কহো মোরে
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

কর্ণ চরিত্রে দ্বন্দ্ব এখানে শীর্ষবিন্দু ছুঁয়েছে। জীবনের বহু আঘাতের দীর্ণতায় কর্ণ বুঝেছেন, বিধাতার নিষ্ঠুর বিধান শুধু তাঁর জন্যই। আগামীকালের যুদ্ধে যে কর্ণ বীরের কীর্তি রচনা করতে পারতেন, এই নতুন পরিচয়, নতুন উপলব্ধি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিল এক নতুন পরীক্ষার সামনে।

অর্জুনকে যুদ্ধে প্রতিপক্ষরূপে পাবার জন্য কর্ণের আজীবনের যে প্রতীক্ষা, এই মুহূর্ত থেকে তার আর কোনো মূল্য রইল না। রাজকূলে জন্মের পরিচয় কর্ণকে যে সমুন্নত জীবন দিতে পারত, জন্মের পর জলে ভাসিয়ে দিয়ে কুন্তী তার ব্যর্থতার সূচনা করেছিলেন। আর আজ, যখন কর্ণের জীবনের চরম কীর্তির ক্ষণ উপস্থিত, আবার সেই কুন্তীই জন্মপরিচয় ব্যক্ত করে দিয়ে তাঁর কপালে পরিয়ে দিলেন ব্যর্থতার টীকা। এখানেই কর্ণের ট্রাজেডি, পৃথিবীর আর কোনো পুত্রের জীবনে মায়ের জন্য এমন ট্রাজেডি ঘনিয়ে এসেছিল কিনা সে সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। মহাভারত পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, কর্ণের জীবনের ট্রাজেডি আরও ভয়ঙ্কর। মেঘনাদকে অন্যায়যুদ্ধে নিরস্ত্র অবস্থায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হত্যা করেছিলেন লক্ষ্মণ ; সে কাজে তাঁর সহায় ছিলেন দেবতারা। কর্ণের জীবনেও তাই ঘটেছে। জন্মের সময়েই তাঁর জীবন যাত্রা করেছিল স্রোতের প্রতিকূলে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন কখনোই তাঁকে হারাতে পারতেন না যদি তাঁর কাছে কবচ-কুণ্ডল থাকত। ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে সেই কবচকুণ্ডল দান হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলেন কর্ণের কাছ থেকে। মেঘনাদের মতই তাঁকে লড়তে হয়েছিল অন্যায় যুদ্ধে। কিন্তু ট্রাজেডির সব লক্ষণ থাকলেও এ নাটকে সত্যকে জানার পর কর্ণ বিনাদ্বন্দ্বে বীরের মৃত্যু চেয়ে নিয়েছেন। ফলে ট্রাজিক রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

অন্যদিকে কর্ণের তুলনায় কুন্তীর ট্রাজেডি কোনো উচ্চতায় পৌঁছয় নি। নিজের অপরাধের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। পঞ্চপুত্র বুকে নিয়েও কুন্তীর 'চিত্ত পুত্রহীন', তাঁর মনে আজও সেই পুত্রকে কোলে নেওয়ার জন্য আকাঙক্ষা জেগে আছে। তাঁর প্রার্থনা—

যবে মুখে তোর
একটি ফুটেনি বাণী তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি—বৎস, সেইমুখে
ক্ষমা কর। কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভৎর্সনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল,
পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক নির্মল।

কর্ণ তাই চেয়েছেন মায়ের পদধূলি। কুন্তী এবার আরও অকপট। ভালো লাগে তাঁর এই অনাবিল উন্মোচন। নিজের স্বার্থ ঘোষণা করেছেন—

তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবার প্রবেশ করেছে মা ও সন্তানের সম্পর্কের মাঝে। কঠিন ও নগ্ন রণরীতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন কুন্তী। পাণ্ডবপক্ষের বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে কুন্তী কর্ণকে ডাক দিলেন পাঁচভাইয়ের পক্ষে।

এবার কর্ণ ফিরছেন বাস্তবে, কর্তব্যের কঠিন মাটিতে। কোনো দানের জীবন এই টুকরো হয়ে যাওয়া কর্ণের কাছে কাম্য নয়। পালক পিতামাতাই তাঁর একমাত্র ও নিশ্চিত আশ্রয়। সেখানে কোনো চাওয়া-পাওয়ার হিসেব ঢুকে পড়েনি কোনোদিন। তাই কর্ণের শান্ত উচ্চারণ—

মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।

কর্ণ চরিত্র এখানে আরও গৌরবমণ্ডিত। এ কর্ণ লোভ, ঈর্ষা, পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে। সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে কুন্তী আরও বড়ো ভুলটি করলেন। মাতৃস্নেহের আকাঙক্ষা ও ভাতৃস্নেহের আগ্রহে কর্ণ একটু যেন টালমাটাল হয়েছিলেন। কিন্তু সিংহাসনের কথায় সেই ঘোর যেন কেটে গেল—

সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।

নাটকের ক্লাইম্যাক্স এখানে। এখানে কর্ণ চরিত্রের গৌরব, আর কুন্তী চরিত্রের পতন। কর্ণ এমন বিন্দু-তে পৌঁছেছেন নিজের দুর্ভাগ্যের স্রোত ঠেলতে ঠেলতে, যেখানে দাঁড়িয়ে সব চেয়ে কঠিন কথাটি মাকে বলতে পারলেন।

কর্ণের প্রত্যাখ্যান কুন্তীর সামনে স্পষ্ট করে দিল ধর্মের সুকঠিন দণ্ডকে। একদিন যে ধর্ম রক্ষার জন্য নিজের সদ্যোজাত পুত্রকে তিনি জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, আজ সেই ধর্মই তাঁর পুত্রকে কর্তব্যে অচঞ্চল রেখেছে। একদিন যে অপরাধ করেছিলেন, আজ সেই অপরাধ-ই তাঁকে কঠিন শাস্তি দিল। ‘গান্ধারীর আবেদনে’ ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রেও সেই দৃশ্য হয়েছিল অনিবার্য। তবে ‘অন্তরে-বাহিরে অন্ধ’ ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে পুত্রের জন্য ধর্মত্যাগের দুঃখ ছিল, গ্লানি ছিল। সেই বেদনাই তাঁকে পরিয়েছে ট্রাজেডির অগ্নিমুকুট। কিন্তু কুন্তী চরিত্রে নির্লজ্জ স্বার্থপরতা পুত্রস্নেহের চেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। নাটকের শেষে আমরা দেখি, কর্ণের জন্য মাতৃহৃদয়ের হাহাকারের থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে পাণ্ডুপুত্রদের ক্ষতির আশঙ্কা—

ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কি অভিশাপ!

শিশুকর্ণকে ত্যাগের বিবেক দংশনের চেয়েও পাণ্ডবজননীর পুত্রদের মঙ্গলচিন্তা এখানে প্রকট। কুন্তীর স্নেহ এখানে একদেশদর্শী। তাই হারানোর যন্ত্রণা থাকলেও কুন্তীর ট্রাজেডি মহান নয়।

শেষ পর্বে কর্ণের ট্রাজেডি আরও মহত্ত্বে উত্তীর্ণ। যে বরলাভের আশায় কুন্তী এসেছিলেন কর্ণের কাছে, তা তিনি লাভ করেছেন। বেদনাদীর্ণ নিঃসঙ্গ বীর কর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন—

মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।

এর চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি কুন্তীর ছিল কী? জীবনের ব্যর্থতাকে বরণ করেছিলেন বীর কর্ণ। আজ সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তিনি। ‘নক্ষত্র আলোকে ঘোর যুদ্ধফল’ পাঠ করে ফেলেছেন কর্ণ। জীবনের সুকঠিন অভিজ্ঞতায় আজ তাঁর কোনো পার্থিব আকাঙক্ষা নেই, সত্য শুধু কর্তব্য আর ধর্ম। সর্বস্ব দান করে নিঃসঙ্গ কর্ণ তাই চেয়ে নিয়েছেন মায়ের আশীর্বাদ—

জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

এই কর্ণের কোনো অতীত নেই, বর্তমান নেই। ‘বীরের সদ্‌গতি’ অর্থাৎ বীরের মতো মৃত্যুই চেয়েছেন কর্ণ। আর সেখানেই জিতে গেছেন মহান বীর, চিরদুর্ভাগ্যের প্রতীক কর্ণ।

একাব্যে ছায়া ফেলেছে উনিশ শতকের শেষার্ধের ভারতীয় মনন। মনে রাখতে হবে, ভারতের অতীত ঐতিহ্য থেকে তুলে এনে রবীন্দ্রনাথ কর্ণ চরিত্রকে দিয়েছেন সেই ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব, যার আদর্শ পরাধীন ভারতবাসীর কাছে সেদিন প্রয়োজন ছিল।